কিশোর সায়েন্স ফিকশন

স্টারগেট

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

জলছবি প্রকাশন

কিশোর সায়েন্স ফিকশন

স্টারগেট

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়

১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com
ISBN : 978-984-93261-3-7

প্রচ্ছদ
কাব্য কারিম
মূল্য : ১৮০ টাকা

পরিবেশক

ম্যাগনাম ওপাস
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট (বেজমেন্ট)
ঢাকা-১০০০
অনলাইন পরিবেশক

রকমারি.com

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭.

Star Gate, by **Muhammad Anwarul Hoque**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 180.00, US $ 6

উৎসর্গ

জগদানন্দ রায়

লেখকের কথা

সায়েন্স ফিকশনের সাথে প্রথম পরিচয় হয় বিটিভিতে প্রচারিত 'দ্য গার্ল ফ্রম টুমরো'র মাধ্যমে। এই ধারাবাহিকটিতে দেখা যায় ৩০০০ সালের একটি মেয়েকে অপহরণ করে ১৯৯০ সালে নিয়ে আসা হয়। পরিচয় হয় ৩০০০ সালের পৃথিবীর সাথে। এই পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য, ২৫০০ সালে ঘটে যাওয়া বিশাল ধ্বংস প্রক্রিয়ার পর পৃথিবীর মানুষ নিজেদের স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। জানা যায় মেয়েটির বাবা-মা শনির চাঁদ টাইটানে বসবাস করছে। সময় ভ্রমণের জন্য টাইম ক্যাপসুলের ব্যবহারও দেখি, যা দিয়ে ১৯৯০, ২৫০০ আর ৩০০০ সালের পৃথিবীতে ভ্রমণ দেখানো হয়েছে। এরপর মুহম্মদ জাফর ইকবালের 'নয় নয় শূন্য তিন' বইটি পড়ার মাধ্যমে সায়েন্স ফিকশন পড়ায় হাতেখড়ি আমার।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় প্রথম বাংলা সায়েন্স ফিকশনের নাম ছিল শুক্র ভ্রমণ। লিখেছিলেন জগদানন্দ রায়, ১৮৫৭ সালে। একটি অদ্ভুত ঘূর্ণিঝড়কে বোতলবন্দী করা নিয়ে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৯৬ সালে লিখেন 'পলাতক তুফান'। সায়েন্স ফিকশনের রাজপুত্র স্যার আইজ্যাক আসিমভ মনে করতেন, মানুষ যতক্ষণ না যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞানকে গল্প লেখার কাজে ব্যবহার করবে, ততক্ষণ কোন লেখাকে সায়েন্স ফিকশন বলা যাবে না। সে হিসাবে বাংলা সাহিত্যে প্রথম সফল সায়েন্স ফিকশন ছিল হুমায়ূন আহমেদের 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা'।

বিভিন্ন সময়ে আমি নিজেও কিছু সায়েন্স ফিকশন লেখার চেষ্টা করেছি। আমার প্রিয় বিষয় টাইম ট্র্যাভেল, প্যারালাল ওয়ার্ল্ড। আমি নিজেও প্যারালাল ওয়ার্ল্ড বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি একেক ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা যেমন একেক টিভি প্রোগ্রাম দেখি ঠিক তেমনি এই সৃষ্টি জগতেও কোন না কোন ফ্রিকুয়েন্সি সেট করা আছে যেখানে এই আমি, আপনি, আমরা সবাই আছি। অন্য ফ্রিকুয়েন্সিতে হয়ত আমাদের মতই কেউ আছে কিংবা একেবারে অন্য কেউ।

প্রতিটা মোবাইল অপারেটর কোম্পানির জন্য আলাদা আলাদা ফ্রিকুয়েন্সি থাকে। প্রতিটা কোম্পানির কোটি কোটি গ্রাহক। এক অপারেটর থেকে আরেক অপারেটররে কল যেতে হলে একটি নির্দিষ্ট ফাংশনের মাধ্যমে যেতে হয়। যেদিন মানুষ এক ফ্রিকুয়েন্সির সাথে আরেক ফ্রিকুয়েন্সির কানেকশন করাতে পারল ঠিক সেদিন থেকেই এক অপারেটর থেকে আরেক অপারেটররে কল করা সম্ভব হল।

এমন দিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন আমরা সৃষ্টি জগতের এক ফ্রিকুয়েন্সি থেকে অন্য ফ্রিকুয়েন্সিতে যেতে পারব। আজ আমরা হাতের মোবাইল দিয়ে কয়েক হাজার মাইল দূরের বন্ধুর সাথে ভিডিও চ্যাট করছি। ভেবে দেখুন, আজ থেকে একশো বছর আগেও এমন কথা কেউ বললে তাকে পাগলই বলত। তাহলে আজ আমরা গল্পের ছলে যা বলছি, লিখছি তা থেকেও রোমাঞ্চকর জিনিস প্রচলিত থাকবে এক হাজার বছর পরেই!

সায়েন্স ফিকশন আমার কাছে রঙিন ঘুড়ির মতো। কল্পনার সীমানা পেরিয়ে যে ছুটে চলে মহাজাগতিক পরিমন্ডলে –নীহারিকা, গ্যালাক্সি, প্যারালাল ওয়ার্ল্ড ... ছাড়িয়ে সুদূরের পথে। এ যেন সময়টাকে স্থির করে দিয়ে এর আদি-অন্ত দেখার মতো। তারপরও এ ঘুড়ি যেমন ইচ্ছে তেমন উড়তে পারে না, সুতোয় টান পড়ে বলে। এ টান যুক্তির টান। যৌক্তিক কল্পনা বললে ভুল হয় না। তারপরও নিজ ইচ্ছেয় সুতোটাকে ছিঁড়ে দিতে ভালো লাগে মাঝে মাঝে।

একসময় ভাবতাম সায়েন্স ফিকশন লেখক হবো। কিন্তু প্রফেশনাল কাজের চাপে আমার সেই স্বপ্নটা যে কখন চাপা পড়ে গেল টেরই পেলাম না। তবে এবার কবি ও গীতিকার নাসির আহমেদ কাবুল ভাইয়ের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এই লেখাটি বই আকারে বের হচ্ছে। কৃতিত্ব পুরোটাই কাবুল ভাইয়ের।

লেখালেখি নিয়ে ফেসবুকে একটি গ্রুপ আছে, সেখানে আপনাদের মূল্যবান মতামত আশা করি। আমার লেখার ভালো-মন্দ-ত্রুটি সেখানে তুলে ধরলে কৃতজ্ঞ থাকব।

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান
শাপলা হাউজিং, পশ্চিম আগারগাও, ঢাকা।
www.facebook.com/groups/mahkbd

“তাঁর এক নিদর্শন নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম।”

- সুরা শুরা, আয়াত ২৯।

মেঘের দেশে

জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহ, জুন মাস।
বেলা এগারোটা থেকে কিছুটা বেশি! দুপুরের কাছাকাছি।

রনি আর রাফি এয়ারপোর্টে এলো। ডমিস্টিক টার্মিনাল। দুই ভাইয়ের মাঝে প্রচণ্ড উত্তেজনা। জীবনে প্রথমবার মা-বাবা-অভিভাবক ছাড়া শুধু দুই ভাই বেড়াতে যাচ্ছে। সেটাও কক্সবাজারে! তাও আবার প্লেনে!

সপ্তাহ দুই হয়েছে রনি আর রাফির এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। ছাত্র হিসেবে দুজনই তুখোড়। এসএসসিতে তারা গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছিল। এবারও আশা রাখছে একই রেজাল্ট হবে। রনি রাফির মামাতো ভাই আর রাফি রনির ফুফাতো ভাই। রনির বাবা বলেছিলেন যে, তাদের পরীক্ষার পর তাদের প্লেনে করে কক্সবাজারে ঘুরতে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। রনির বাবা দুই ভাইকে দুটো আইফোনও গিফট করেছেন। তারা আগেও স্মার্টফোন ব্যবহার করেছে, তবে সেটা মা-বাবার। এই প্রথম তাদের স্মার্টফোনও হলো। গত সাতদিনে দুই ভাই আইফোনের উপর মোটামুটি ‘পিএইচডি’ করে ফেলেছে। এয়ারপোর্টে আসার জন্য তারা ‘উবার এপস’ পর্যন্ত ব্যবহার করেছে।

ট্যাক্সি থেকে নামার পর ওরা এয়ারপোর্টের ভিতরে ঢুকল। লাগেজ স্ক্যানিংয়ের পর তারা রিজেন্ট এয়ারের কাউন্টারে

গেল। রাফি পকেট থেকে টিকেট বের করে কাউন্টারে দেখাল। কাউন্টারে দায়িত্বে আছে লাল শাড়ি পরা সুন্দরী একটি মেয়ে। তিনি বললেন, আপনাদের আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

তাদের ফ্লাইট দুপুর আড়াইটায়। ঘড়িতে এখন দুপুর পৌনে বারোটা। রনি আর রাফি হেসে উত্তর দিল, আচ্ছা।

ওরা দুজন এয়ারপোর্টের ভিতর ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলো। ডমিস্টিক টার্মিনাল এতোটাই ছোট যে, তাদের সেভাবে কোন সময়ই লাগল না। তারপরও প্রথমবার বলে তাদের সব কিছুতেই উত্তেজনা আর গভীর আগ্রহ। ভিতরে ছোট্ট একটা কফির দোকান। সেখানে তারা কফি খেল। সময়ও কিছুটা কাটল।

কফি শেষ করে বারোটার দিকে তারা আবারও কাউন্টারে গেল। যিনি দায়িত্বে আছেন, তিনি তাদের দেখে বললেন, আসুন স্যার।

রনি টিকিটটা দিল।

দায়িত্বরত কর্মকর্তা টিকিট নিয়ে কম্পিউটারে চেক করলেন। রনি উশখুশ করছে। সে দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে কিছু বলতে চাইল। পারল না। এমনিতেই সে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়, তার উপর এ তো খুবই সুন্দরী! রাফি খুব সাহস করে বলে ফেলল, উইন্ডো সিট প্লিজ!

মামা বলে দিয়েছেন যে, তাদের বিমানটা হবে বোয়িং। তাই যেন বোডিং পাস নেবার সময় জানালার পাশের সিটের কথা বলে। তাহলে যাবার পথে মেঘের ভেলা আর নিচের সবকিছু দেখতে পাবে ওরা।

সুন্দরী কর্মকর্তা একটু হেসে উত্তর দিলেন, সিওর! স্যার, আপনারা কি কক্সবাজারে প্রথম যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। - রাফি চটপট উত্তর দিল।

আপনাদের আইডি কার্ড আছে?

রনি তাদের দুইজনের কলেজের আইডি কার্ড তার হাতে দিল। একটু পরেই মেয়েটি তাদের হাতে আইডি কার্ড ফেরত দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো লম্বা টিকেটও দিয়ে বলল, এই আপনাদের বোর্ডিং পাস। তারপর হাত দিয়ে একটু দূরে গেট দেখিয়ে দিল।

একজন এটেন্ডেন্ট এসে ওদের কাছে জানতে চাইলো লাগেজ দেবে কিনা। ওরা লাগেজ দিয়ে দিল আর দুটো টোকেন নিল।

গেট দিয়ে ঢোকার সময় তাদের টিকিটে সিল মেরে দিল। ভিতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। অনেক মানুষ! কেউ বসে আছে, কেউবা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, কেউবা হাঁটাহাটি করছে। ওদের সব চাইতে মজা লাগল যখন শুনতে পেল কেউ বার-বার বলছে, নভোএয়ার রাজশাহী—নভোএয়ার রাজশাহী কিংবা রিজেন্ট এয়ার চট্টগ্রাম—রিজেন্ট এয়ার চট্টগ্রাম! এভাবে যে এয়ারপোর্টে ডাকে সেটা তাদের ধারণায় ছিল না। রনি বলল, ভাই কেমন যেন গাবতলী-গাবতলী লাগছে!

রাফি রনির থেকে মাস ছয়েক বড়। দুজনই পাঁচ ফুট সাতের উপর। রাফি রনির থেকে কিছুটা ফর্সা, রনিকে উজ্জ্বল শ্যামলাই বলা যায়। রাফির স্বাস্থ্য রনির থেকে কিছুটা ভালো। দুজনেরই চুল ঘন তবে রনির চুল কিছুটা কোঁকড়ানো। রনির পরনে কালো প্যান্ট আর হালকা নীল টিশার্ট। রাফির নীল জিন্স আর লাল টিশার্ট। দুজনের পায়েই কেডস। রনি আর রাফি কেউ কখনও কাউকে নাম ধরে ডাকে না। একজন আরেকজনকে ভাই বলে ডাকে। দুই ভাইয়ের মাঝে খুব

মিল। বাসা কাছাকাছি আর একই স্কুল কলেজ হওয়াতে দুজন সবসময় এক সঙ্গেই বড় হয়েছে।

রাফিও উত্তর দিল, তাইতো ভাই।

হঠাৎ কেউ একজন বলে উঠল, এই রাফি তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

দুজনই এক সঙ্গে ঘুরে গেল, স্যার আপনি!

হুম, তোমরা এখানে?

কক্সবাজার যাচ্ছি স্যার।

সবাই?

না স্যার, আমরা দুজন।

শুধু দুজন!

হ্যাঁ স্যার, মামা আমাদের গিফট করেছেন। বলেছিলেন পরীক্ষার পর আমাদের প্লেনে করে কক্সবাজার যেতে দিবে।

ভালো। তোমাদের বাবা-মা ভালো আছেন?

হ্যাঁ স্যার, আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন।

এসো আমার সঙ্গে। এই বলে রুবেল স্যার তাদের ডান পাশের একটা সুন্দর ওয়েটিংরুমে নিয়ে গেলেন। ওরা লেখা দেখল, আমেরিকান এক্সপ্রেস লাউঞ্জ।

যাও, ইচ্ছেমত যা খুশি খাও। সব ফ্রি।

রুবেল স্যার ওদের ক্লাস সিক্স আর সেভেনে বাসায় এসে পড়াতেন। পরে ভালো একটা চাকরি হবার পর আর পড়াতে পারেননি। তবে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ সবসময় ছিল তার। তিনি যে কী চাকরি করেন, সেটা ওরা ঠিক জানে না। পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা বাহিনী অথবা সরকারী কোন সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করেন হয়ত। কোন ডিপার্টমেন্টে চাকরি করেন, সেটা কখনও তিনি বলেননি। এ প্রশ্ন করলে সবসময় বলেছেন, পুলিশে আছি। কিন্তু তাকে কখনও গতানুগতিক পুলিশের কোন কাজে যেতে কেউই দেখেনি।